# একক ১০৯ ❑ অনুবাদচর্চার কারণ, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী

গঠন

১০৯.১ উদ্দেশ্য

১০৯.২ প্রস্তাবনা

১০৯.৩ মূলপাঠ ১—অনুবাদচর্চার কারণ

১০৯.৪ সারাংশ ১

১০৯.৫ অনুশীলনী ১

১০৯.৬ মূলপাঠ ২—অনুবাদচর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

১০৯.৭ সারাংশ ২

১০৯.৮ অনুশীলনী ২

১০৯.৯ উত্তরমালা

১০৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

## ১০৯.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করেন, তাহলে আপনি—

- অনুবাদচর্চা কেন করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- অনুবাদের তিনটি প্রকরণ সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন।

## ১০৯.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি মূল দুটি ভাগে বিভক্ত। এককটির প্রথম অংশে ১৮ শতাব্দীর জার্মানী মনীষী ইয়োহান গটফ্রিড হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি জার্মানিরই মহাকবি ভল্‌ফগ্যাঙ গ্যেটে কেন পারস্পরিক ভাবে সাহিত্যের সৃজন-সম্ভার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য, অনুবাদই সবেচেয়ে কার্যকরী পন্থা, একথা উল্লেখ করে—কেন যুগে যুগে অনুবাদচর্চার প্রয়োজন ঘটেছে, সেকথাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখিত। সংস্কৃতভাষায় লেখা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ কেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি, অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণ নিয়েও এখানে বিস্তৃতভাবে তথ্যবিচার ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

আপনি যদি এই এককটি ভালো করে পড়েন, তাহলে আপনি অনুবাদচর্চার কারণ এবং বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তু সহজ করে, আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না। ভালো করে এককটি পাঠ করে অনুশীলনী দুটির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

## ১০৯.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদচর্চার কারণ

বিখ্যাত জার্মান কবি-দার্শনিক গ্যেটের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু হার্ডারই সর্বপ্রথম ‘বিশ্বসংস্কৃতি’ নামে এক ধারণার কথা বলেন। একটি বিশেষ দেশের সংস্কৃতি যদি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো কারণে অন্যদেশে ছড়াতে না পারে, বা অন্যদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য গুণগুলিকে আত্মগত করতে না পারে, তাহলে সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যদি বিনিময় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার সমৃদ্ধি এবং বিকাশ রুদ্ধ হতে বাধ্য। এই বিনিময়ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই এটিও

মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক দেশেরই আলাদাভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে। সেই পৃথক চরিত্রেকে নিয়েই সেইসব আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মিলগুলিকে খুঁজে নিয়ে কাছাকাছি আনতে হবে এবং তাদের ভিতরকার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায়, পারস্পরিকভাবে বিনিময় করতে হবে। কাজেই একটি বিশেষ ভাষায় লেখকের কাজ হবে তাঁর নিজের ভাষার ভাবনাচিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গির যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে অন্যদেশের লেখক ও পাঠকদের সামনে মেলে ধরা। যদি কোনো ভাষা সাহিত্যিক ঐতিহ্য, সৃষ্টিকর্মে, দক্ষতায় অন্যদেশের তুলনায় কম সমৃদ্ধ হয় তাহলে সেই দেশের সাহিত্য অন্যান্য সব সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে চিন্তাভাবনা বা সৃষ্টিকর্মের শৈলীজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে একটি বিশেষ দেশের সাহিত্যের লেখক একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং সেই বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারি। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধ জাগরূক করার জন্য ও ব্যাপক ও সুষ্ঠু অনুবাদকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে আছে, সে কথাও এখানে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য।

তবে একটি কোনো সাহিত্যের এলাকাভুক্ত লেখকের পক্ষে বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করতে গেলে বহুভাষাবিদ্ হতে হবে। সাধারণভাবে, প্রত্যেকটি সাহিত্য পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই দু-চারজনই থাকেন যাঁরা একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সেইজন্যই গ্যেটে পারস্পরিক ভাবনার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, যে-কোনো সাহিত্যেই 'ভালো' অনুবাদ দুর্লভ। (এখানে প্রচলিত একটি ইতালীয় প্রবচন স্মরণীয় ''অনুবাদ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে তাকে অবিশ্বস্তা হতেই হবে এবং বিশ্বাসভাগিনী হলে, কুদর্শনা হবেই সে!'') কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুবাদ আমাদের করতে হবে এবং অনুবাদের মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। কেননা, প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির সক্রিয়তা থাকে, সেগুলিকে অন্যদেশের ভাষায় অনুবাদ করা খুবই সমস্যার ব্যাপার।

কিছু আগেই বলেছি যে, দেশে-কালের দূরত্ব মোচনের যে কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে, তার মধ্যে অনুবাদ একদিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক এবং তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজও এক অর্থে অনুবাদকেরই দায়িত্ব বলে স্বীকার্য, অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্রণোদনার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর

সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা জঙ্গম হয়ে ভাব-বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' বা ধ্রুপদী নাম দিয়েছি এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ এই ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা বা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে। আর সেইজন্যই যুগে-যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভাষাই সাহিত্যের বাহন, তাই কোনো একটি অনুবাদ চিরকাল ধরে পর্যাপ্ত বলে গণ্য থাকে না, প্রত্যেকটি যুগ তার সমকালীন ভাষায় যে বিশেষ ভঙ্গির এবং ভাবনার যে বিশিষ্ট চরিত্রের জন্ম দেয়, তার মধ্যে দিয়েই পুরোনো অনুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাগুলিতে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের প্রচুরায়ত অনুবাদ প্রতি যুগেই হয়ে আসছে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই ঘটেছে।

আবার অন্যভাবে দেখলে এটাই বলতে হয় যে, অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই অন্যভাষার মূল রচনা পড়া সম্ভবপর হয় না বলে অনুবাদের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় এক-একটি অনুবাদ এক-একটি দেশ বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদ্‌লে দিয়েছে, এমনকি যাঁরা মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাও অনেক সময়েই ভালো অনুবাদ পড়ে লাভবানই হন—কারণ ভালো অনুবাদ শুধুমাত্র মূল রচনার প্রতিনিধিত্বই করে না, তার যুগ ও অনুবাদকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাদও পাঠককে উপলব্ধি করায়। এখানে একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নও অবশ্য ওঠে ''গুড ট্রানস্লেশ্যন ইজ অ্যাকচুয়ালী গুড ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন'' (ভালো অনুবাদ বস্তুতপক্ষে নতুন একটি রূপসৃষ্টিই) এই তত্ত্বগত অবস্থানটিকেও মেনে নিতে হয় সুসাহিত্যপাঠের খাতিরে। এই 'নতুন রূপসৃষ্টি বা 'ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন' কিন্তু নির্বাধন স্বাধীনতার ছাড়পত্র দেয় না; মূল সৃষ্টির ভাব সৌন্দর্যকে অনাহত রেখেই কিন্তু যে-সংস্কৃতি বলয়ের ভাষায় তার 'অনুবাদ' - তথা - 'নতুন রূপায়ণ' করা হয়েছে, তার শৈলী ও রুচি মর্জিকে সেখানে সংলগ্ন করতে হবে আন্তন চেখভের নাটক 'চেরি অর্চাড'-কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মঞ্জুরী, আমের মঞ্জুরী'-তে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন-এর একটি ভালো নিদর্শন হিসেবে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## ১০৯.৪ সারাংশ—১

এই আলোচনা শুরুতেই, বিশ্বসংস্কৃতির ধারণায় কথা হার্ডার-ই সর্বপ্রথম বলেন সে কথার উল্লেখ করেছি। এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময়ে করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম

এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় হবে। তবে বিনিময় করার সময় প্রত্যেক দেশের জাতীয় সংস্কৃতি নামক পৃথক চরিত্রকে বজায় রাখা প্রয়োজন। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে একটি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিকও নিজের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং এভাবে সকলেই আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যেমন বিভিন্ন ভাষা জানা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মাত্র পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্যেটে অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে চেয়েছিলেন। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য অনুবাদ-ই সবচেয়ে কার্যকরী। প্রাচীন সাহিত্য যাকে আমরা 'ক্লাসিক' (ধ্রুপদী) নাম দিয়েছি, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

## ১০৯.৫ অনুশীলনী—১

**নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর শেষে, প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

১. অনুবাদচর্চার প্রয়োজন কেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

২. গ্যেটে পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় কেন নিতে চেয়েছিলেন, তা লিখুন।

৩. ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে অনুবাদচর্চার গুরুত্ব বেশি কেন, সেটি বুঝিয়ে বলুন।

৪. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ভাবে_____ বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে।

(খ) _____ পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

## ১০৯.৬ মূলপাঠ ২—অনুবাদ-চর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ভাবজীবনে যে-অভিনব চিন্তাতরঙ্গের আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তা সাধারণভাবে রেনেসাঁস বা নবচেতনা নামে চিহ্নিত। ইংরেজ-অধিকার এই দেশের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করল এবং তার ফলে পল্লীসংস্কৃতি শুকিয়ে গেল। ইংরেজের

ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক হলে নতুন গড়ে ওঠা একটি ধনবান ও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের (মূলত, ইংলন্ডেরই) সংস্কৃতি ছিল তাদের কাছে অনুকরণীয়, এর পাশাপাশি তারা বিজয়ী শাসকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিকেও অনুসরণ করতে থাকল। কাজেই দেখা গেল নবচেতনার কালে প্রাচীন সংস্কৃতির অবক্ষয়, ভাঙনের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণের জন্য শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে দুর্বলভাবে অনুসরণ (বা অনুকরণ) করাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই অনুকরণের যা-যা উপজীব্য ছিল, তাদের মধ্যে আধুনিক যুগের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও দেখা যায়। অন্যভাবেও এই অনুকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিতকে নাড়িয়ে দিল, তেমনি আবার সেই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নতুন বিরোধের বীজও লক্ষ করা গেল। যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল, তারাই আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। একারণে বিজয়ী সংস্কৃতির আদর্শ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এইসময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা, যেমন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। আবার, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কৃষ্টি-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও সুপ্রতিষ্ঠ অবস্থানও তাঁদের বিশেষভাবে অভীপ্সিত ছিল। উনিশ শতকে প্রথম অর্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল আর পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যর ভাবরূপের অনুপ্রেরণায় নতুন একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠল। আর তারই অনুষঙ্গে অনুবাদেরও ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিল। আধুনিক যুগেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে যেভাবে অধ্যয়ন করে চলেছেন তা তাঁদের মৌলিক রচনায় যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর মূলত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হল ১৮১৭ সালে। এই সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে অনুবাদই প্রধান অবলম্বন ছিল। সংস্কৃতি, ফারসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকেই অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয় এই সময় থেকে।

১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী রচিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'—'গস্‌পেল অব সেন্ট ম্যাথু'—ইংরেজি থেকে বাংলায় প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। এরপরে ১৮০৩-তে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' নামে ঈশপের

গল্প কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়। বাংলা অনুবাদটি করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। ফোর্ট উইলিয়মের অন্যতম সেনানী সি. মংকটন ১৮০৯ সালে শেক্সপিয়রের 'দ টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র জে. সার্জেন্ট প্রথম বাংলায় পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের প্রথম সর্গ তিনি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেন। এরপরে গিরিশচন্দ্র বসু ''ইলিয়াড''-এর প্রথম সর্গ এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'-এর অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হোমারের কাব্য 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে অনুবাদ করেন। এই সময় হরিমোহন গুপ্ত পার্নেলের 'দ্য হার্মিট' কাব্যের অনুবাদ করেন। অনুবাদটির নাম 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান।' ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় গোল্ডস্মিথ-এর 'ডেজার্টেড ভিলেজ'-এর অনুবাদ করেন 'পরিত্যক্ত গ্রাম' নামে। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' কবিতার অনুবাদ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী এই নামে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৫-তেওয়াল্টার স্কটের 'দ্য ল্যে অবদ্য লাস্ট মিনস্টেল'-এর অনুবাদ করেন রাখালদাস সেনগুপ্ত' 'শেষ বন্দীর গান নাম' দিয়ে।

এরই পাশাপাশি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক রচনাতেও অনুবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। ১৮৭৬ সালে জোনাথন সুইফ্টের-এর 'গালিভার'স ট্রাভেল্স'-এর 'অপূর্ব দেশভ্রমণ' নাম দিয়ে উপেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'অদ্ভুত দিগ্বিজয় (প্রথম খণ্ড)' নাম দিয়ে বিখ্যাত স্পেনীয় লেখক সার্ভেন্তিসের 'দোন কীহোতে' (ডন কুইক্জোট) এবং 'মন্মথ মনোরমা' (প্রথম খণ্ড) নাম দিয়ে হেনরি ফিলডিঙের 'আমেলিয়া'—এই গ্রন্থদুটির অনুবাদ করেন বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। সেকালের ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় রেনল্ডসের 'মিস্ট্রিজ অব দ্য কোর্ট অব লন্ডন'-এর কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয় সেই সময়ে কথাসাহিত্যের অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি ফরাসি ভাষা থেকে বার্নার্দ্যাঁ দ্য সাঁ পিয়ের-এর 'পোল এৎ ভির্জিনি'র 'পৌলবর্জিনী' নামে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ছোটগল্প প্রমথ চৌধুরীর 'ফুলজানি' ফরাসি লেখক প্রস্পার মেরিমির গল্প থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিলিতি নাটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাবানুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর ভাবানুবাদ করেন তিনি 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাম দিয়ে। ১৮৫৪-তে তিনি আবার শেক্সপিয়রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' তার হাতে পরিণত হয় 'চারুমুখ চিত্তহরা'-তে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি হোমারের 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) নামে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগ অনুবাদের ক্ষেত্রে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেন 'নলিনী বসন্ত' নাম দিয়ে। এরপরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুসরণে 'রোমিও জুলিয়েত' নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—লংফেলোর রচিত 'সাম্ অব লাইফ'-এর অনুবাদ 'জীবন সঙ্গীত', আলেকজান্ডার পোপের 'এলয়সা টু আবেলার্ড'-এর প্রেরণায় 'মদন পারিজাত', শেলির 'দ্য স্কাইলার্ক-এর অনুসরণে 'ভরতপক্ষীর প্রতি' (চাতকপক্ষীর প্রতি) ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি পুরো মূলানুগ, তবে 'মদন পারিজাত'-এ স্থানে স্থানে মূলনানুগত্য লক্ষ করা যায়। 'ভরতপক্ষীর প্রতি', যা পরে হয়েছিল 'চাতকপক্ষীর প্রতি কবিতাটিতে কবি মূল রচনাকে প্রায় পুরোপুরি-ই অনুবাদ করতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র সেন শেক্সপিয়রের 'এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম'-এর মর্মানুবাদ করেছিলেন। আরো পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—তাঁর 'গেছে' কবিতাটি ব্রাউনিঙ-এর একটি কবিতার আংশিক ভাবানুবাদ ঃ

''এই পথ দিয়ে গেছে — এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ ফুলে চরণ — অলরক্ত রেখা;
এই পথ দিয়ে গেছে ছিঁড়ে পাতা তুলে ফুল;''
"This path so soft to pace shall lead
Thro' the magic of May to herself indeed?"

এরপরে আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদচর্চার প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্যের বহু কবিতার অনুবাদ তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর এই অনুবাদচর্চার প্রসারিত ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধ কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে সেটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ইচ্ছামতো কবি এখানে শব্দের পরিবর্তন করেছেন। যেমন—"The rumpfed ronyon cries"-এর বাংলা ধরা হয়েছে ''পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে", যাকে আমরা কখনোই অনুবাদ বলতে পারিনা। তবে ডাইনিদের সংলাপের মূল ভাব অনুবাদে ভাষায় আশ্চর্য রকমভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এর পাশাপাশি তিনি ম্যুর, বায়রন, বার্নস কবির বিভিন্ন কবিতা অনুবাদ করেছেন। যেমন—'বিচ্ছেদ কবিতাটির ম্যুরের 'As Slow Our shop'-এর অনুবাদ। 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি বার্নসের 'As Fond Kiss' কবিতারি অনুবাদ। বার্নসের 'O philly, Happy be that day' কবিতার অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)'।

অনুবাদচর্চায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুবাদ প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১ম) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর অনুবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ইংরেজি সাহিত্য আস্বাদন এবং শিক্ষক ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যরস পৌঁছে দেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—শেলি, কীটস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং, এডগার অ্যালান প্যো, ওয়ালট হুইটম্যান প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের লেখার পাশাপাশি, সংস্কৃতি, ফরাসি, চিনা, জাপানি, তামিল ইত্যাদি ভাষা থেকে এবং ডিরোজিও, তরু দত্ত প্রমুখ এদেশি ইংরেজি কবিদেরও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি অনুবাদ সংকলন হল : 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'।

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার আসি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে। উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ। এযুগে শিক্ষিত বাঙালির পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বিদেশি ভাবধারাকে গ্রহণের পাশাপাশি নিজের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের গরিমা আবিষ্কারও করতে চেয়েছেন এবং এর ফলেই প্রাচীন ভারতীয় অনুবাদচর্চা শুরু হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা। সংস্কৃতি ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদির বঙ্গানুবাদকে প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কিছু কারণ উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রথমত, অনেকে বলে থাকেন তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সংস্কৃত থেকে মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হল। সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণে, একসময় ব্রাহ্মণ্য বিধিশাসিত হিন্দুসমাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণজনিত উত্তালতা কিছুটা শান্তরূপ ধারণ করলে সমাজে আবার শিল্প-সংস্কৃতির জোয়ার এলো। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থগুলি, তুর্কি বিজয়ের প্রথম দু-শতকের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার অবসানের পরে এবং চৈতন্য-প্রভাব বিস্তারিত হবার আগে রচিত হয়েছিল। তুর্কি-বিজয়ের ফলে পরাজিত হিন্দুশক্তি ধর্মী, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল কথা ছিল উপরতলার ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারার সঙ্গে লোকজীবনে প্রচলিত অব্রাহ্মণ্য-অবৈদিক-অস্মার্ত-অপৌরাণিক ধারার মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুন ভাবধারা গড়ে উঠেছিল, তার সামনে পৌরাণিক আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকারী। তাই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ।

কিন্তু হিন্দু সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত যা কিনা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল তা জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে একদম জড়িয়ে যাবার সুযোগ পেল।

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন, গৌড়ের সুলতানেরা সিংহাসনে সুস্থির হয়ে রাজসভায় পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার যখন আগ্রহ দেখান, তখন থেকেই এসব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতার-তুর্কি-খোরাসানি-পাঠান-মুসলমানরা প্রথম দিকে দূরত্ব বজায় রেখে এদেশকে শাসন করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা এদেশকে ভালোবেসে, এদেশের ভাষা শিখে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অনেক সুলতান-ই হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইতেন এবং অনেক সময় তাঁরা সেগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেও উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছিলেন, ''মুসলমান, ইরান, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ রইল।" মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে সুলতান বারবক শাহের কথা বলেছেন। আবার কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁর সভাকবি ছিলেন। অবশ্য এঁরা দুজনেই মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সমস্ত মুসলমান নৃপতিরা মহাভারতের কাহিনির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে হুসেনশাহী যুগ নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা এগুলি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে শুধু সুলতান বা নৃপতিদের আনুকুল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন তা নয়, কাব্যগুলির সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়েও সেগুলি অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রথমযুগে রচিত এইসব অনূদিত গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—এই সময় বাঙালি কবিদের সামনে কালিদাসের বিখ্যাত সব কাব্য, নানারকম পুরাণ ইত্যাদি থাকলেও, তাঁরা প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলির অনুবাদই বেশি করেছেন। কারণ কাব্যসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় মাহাত্ম্যের দিকেই তাঁরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা যায়।

প্রথম যুগের অনুবাদকরা অনুবাদ করার সময় মৌলিক চিন্তা অপেক্ষা, মূল গ্রন্থের যে অনুসরণ করতে চাইবেন, তা ছিল স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। কৃত্তিবাস ছাড়া অন্য কবিরা, যেমন—মালাধর বসু, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ মোটামুটি ভাবে মূল গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছেন। তবে মালাধর বসু মূল ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন।

তবে বাংলাভাষায় সংস্কৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালিনীও হয়েছে এবং বাংলা ভাষার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি উপনিষদ্ ও বেদান্তের অনুবাদ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী করেছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ। নবীনচন্দ্র দাস রঘুবংশের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এর পাশাপাশি কালিদাসের প্রতিটি কাব্যের অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া পাণিনির ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অমরকোষ, সাহিত্যদর্পণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থও অনুবাদ হয়েছে।

**ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি ও প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কল্পসূত্র, জগৎরাম ভট্টাচার্যের দশবৈকালিক সূত্র, রাধাগোবিন্দ বসাকের গাথাসপ্তশতীর অনুবাদ সর্বজনবিদিত।** ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের অনুবাদ তো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

❐

এতক্ষণ আমরা ইংরেজি ও সংস্কৃতি অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি অনুবাদের প্রকার পদ্ধতি নিয়ে। অনুবাদের পদ্ধতি অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি। এখানে আমাদের আলোচ্য আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ এবং কবিতার অনুবাদ।

প্রথমে আসা যাক আক্ষরিক অনুবাদের কথায় ঃ

**(১) আক্ষরিক অনুবাদ ঃ** যে-সমস্ত অনুবাদের মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বা মূলানুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দ ও তার নিজস্ব প্রয়োগগত অর্থ বজায় রেখে তার দ্বারা ভাষান্তরে শব্দের নির্মাণ ঘটায়। প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব একটা গৃহীত হয়নি। ইংরেজি থেকে বাংলা করা কিছু অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪১,

বৈশাখ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'-তে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। এখানে প্রথমে মূল ইংরেজি কবিতাটি উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটি দেওয়া হল।

"I saw in luisiana a live oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches,
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green,
And its look, rude, unbending, lusty, made methink of myself.
But I wonder'd how it could utter joyous leaves standing.
Alone there without its friend near, for I knew I could not,
And took off a twig with a certain number of leaves upon
It, and twined around it a little moss,
And brought it away, and I have placed it in sight in my room,
It is not needed to remind me as of my own dear friends.
(For I believe lately I think of little else than of them)
Yet it remains to me a curious token, it makes me think of manly love,
For all that, and though the oak glistens there in
Luisiana solitary in a wide flat space,
Uttering joyous leaves all its life without a friend a lover near,
I know very well I could not."

''লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোন দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলাম শ্যাওলা।

নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝলমল করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।"

অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলানুগ। এমন মূলানুগ অথচ কাব্যরসান্বিত অনুবাদ খুব কম পাওয়া যায়। অনুবাদে কবি মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দেরই যথার্থ্য রক্ষা করেছেন। এমনকি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা-ও মূল ভাবের অনুসারী। যেমন—

"....uttering joyous leaves of dark green."–

পংক্তিটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —

"...ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।"—

এই অনুবাদ একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ এবং কঠিন মূলানুগত্যের বাঁধনে বাঁধা।.... হয়ত কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন সুন্দর ও মূলানুগত অনুবাদ করা সম্ভব—সেই পূর্বোল্লিখিত ইতালীয় প্রবচনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে!

**(২) ভাবানুবাদ ঃ** এতে মূলের অবিকল অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। এমনকি এখানে ভাষা সম্পর্কেও অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে বিশাল অনুবাদ সম্ভার এদেশে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাবানুবাদ-ই বেশি পাওয়া যায়। তবে এইসব গ্রন্থে কবিরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করলেও, অনেক সময় নিজের ইচ্ছামতোও কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে কৃত অনুবাদের সময়ে ভাবানুবাদেরই আধিক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত, নাটকের ক্ষেত্রে এখানে বার্নসের কবিতা "O Philly, happy be that day" এবং তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)" কবিতা মিলিয়ে দেখা যায় ঃ

“HE O Philly, happy be that day
When roving through the gather’d hay
My youthful heart was stown away
And by thy charms my Philly.

SHE O Willy, are I bless the grove
Where first I own’d my maiden-love,
Whilst thou didst pledge the powers above
To be my ain dear Willy.

HE As songsters of the early year
Are ilka day mair sweet to hear,
So ilka day to mair dear,
And charming is my Philly.

SHE As on the brier the budding rose
Still richer breathes and fairer blows
So in my tender bosom grows
The love I bear my Willy.

HE The milder sun and bluer sky
That crown my harvest cares wi’joy
Were ne’er so welcome to my eye
As is a sight of Philly.

SHE The little swallow’s want on wing,
Though wafting o’er the flowery spring
Did ne’er to me sic tidings bring
As meeting o’ my Willy.

HE The bee that through the sunny hour
Sips nectar in the opening flower,
Compared wi’ my delight is poor
Upon the lips of Philly.

SHE The woodbine in the dewy weet,
When evening shades in silence meet,
Is nocht sae fragranter say sweet
As is a kiss o' Willy.

HE Let fortune's wheel at random rin,
And fools may tyne, and knaves may win
My thoughts are a' bound up in one,
And that's my ain dear Philly.

SHE What's a' the joys tha gowd can gie?
I care na wealth a single flie;
The lad I love's the lad for me
And that's my ain dear Willy."

''ললিত। হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন!

নলিনী। কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত। বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী
যত শুনি তত তার ভালে লাগে গীতধার
যতদিন যায় তত তোরে ভালোবাসি
যতদিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী। কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত
এ হৃদয় ভালোবাসা আলো করে আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত। মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী। মধু আগমনে বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত
মিলিলে তোমারি সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত। কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন?

নলিনী। শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত
বিজন সন্ধ্যার বায়ে ফুটে সে মলয়বায়ে
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত। ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক রসাতলে কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী। ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।"

এটি মূল কবিতার মোটামুটি ভাবানুবাদ হয়েছে। মূল কবিতার 'He' এবং She অনুবাদে 'ললিত' ও 'নলিনী' হয়েছে। অনুবাদে মূলের স্তবক রক্ষিত হয়েছে। এমনকি মূল কবিতার ছন্দস্পন্দনও অনুবাদে ধরা পড়েছে। শেষ স্তবকেও প্রথম দু'চরণের ভাবানুবাদ হয়েছে।

**(৩) কবিতার অনুবাদ ঃ** গদ্যের পাশাপাশি কবিতার অনুবাদও লক্ষ করা যায়। কবিতার অনুবাদের তেমন বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় না। কবিতার অনুবাদ যেমন আক্ষরিক হতে পারে, তেমনি ভাবানুবাদও হতে পারে। এখানে বার্নসের 'Ae fond Kiss' কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ কৃত অনূদিত 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি দেওয়া হল।

"Ae fond kiss, and then we sever;
Ae farewel and then, forever!
Deep in heart, wrung tears, I'll pledge thee
Warring sighs and groans I'll wage thee.
Who shall say that fortune grieves him.
While the star of hope she leaves him?
Me, nae cheerful twinkle lights me;
Dark despair around be nights me.
I'll ne'er blame my partial fancy,
Nae thing could resist my nancy;
But to see her and love for ever.
Had we never loved but kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met or never parted,
We have never been broken hearted
Fare thee well, thou first and fairest!

Fare thee well, thou best and dearest!
Thine be like joy and treasure.
Peace, enjoyment, Love and Pleasure!
Ae fond kiss and then we rever."

"একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে নাকো আর
মর্মভেদী অশ্রু নিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেতো তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার,
কিন্তু মোর আশা নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বল উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে ভালোবাসা আসে মনে
ভালোবাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে
যদি নাহি দেখিতাম বিচ্ছেদ না জানিতাম
তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার।
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

এই অনুবাদটি মূল কবিতার আক্ষরিক অর্থ, বাক্য পরম্পরা এবং ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

## ১০৯.৭ সারাংশ—২

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ভাবজীবনে রেনেসাঁস বা নবচেতনা দেখা গিয়েছিল। এই সময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা গিয়েছিল, আর পরবর্তী অর্ধে এই অনুসরণের ফলে গড়ে ওঠা নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল। আর এই প্রয়োজনেই অনুবাদের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন হল। সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকে অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরির 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ইংরেজি থেকে করা প্রথম অনুবাদ। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। এর পাশাপাশি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। ছোটবেলার গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে অনুবাদটি আক্ষরিক নয়। এর পাশাপাশি তিনি ম্যুর, বায়রন, বার্নস প্রভৃতি কবির বিভিন্ন কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু অনুবাদ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল যাকে আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণ ধরা হয় একটি মতে, তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত-পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। আরেকটি মতে,—গৌড়ের সুলতানরা সিংহাসনে বসে রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ জানালে এসব গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় একটি মতে,—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা কাব্যগুলির সাহিত্যরসে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির অনুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি এবং প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদও বাংলায় হয়েছে। যেমন—কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, গাথাসপ্তশতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন—(১) আক্ষরিক অনুবাদ। এই ধরণের অনুবাদে মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়। (২) ভাবানুবাদ—এই ধরণের অনুবাদে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। (৩) কবিতার অনুবাদ—এই অনুবাদ আক্ষরিকও হতে পারে আবার ভাবানুবাদও হতে পারে। এছাড়া আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়।

## ১০৯.৮ অনুশীলনী—২

**নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

১. অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের উদ্ভবের মূলে কী কী কারণ স্বীকৃত হয়ে থাকে?

৪. আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কী বোঝায়, সংজ্ঞা সহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভাবানুবাদ কাকে বলে উল্লেখ করে উদাহরণ দিন।

৬. কবিতার অনুবাদ বলতে কি বোঝায়; উদাহরণ দিন।

৭. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য —— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) বাংলা ভাষার —— ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের —— অনুবাদমূলক।

(গ) কথাসাহিত্য অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ——।

(ঘ) 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যুরের ——-এর অনুবাদ।

(ঙ) রমেশচন্দ্র দত্ত —— অনুবাদ করেছিলেন।

৮. **সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' গ্রন্থটির রচয়িতা —

১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২. তারিণীচরণ মিত্র

৩. হরিমোহন গুপ্ত

(খ) উপেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেছিলেন—

১. অপূর্ব দেশভ্রমণ
২. মন্মথ মনোরমা
৩. পরিত্যক্ত গ্রাম

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)' কবিতাটি—

১. আক্ষরিক অনুবাদ
২. ভাবানুবাদ
৩. কবিতার অনুবাদ

## ১০৯.৯ উত্তরমালা

**অনুশীলনী—১**

**১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।**

৩. (ক) জাতীয় সংস্কৃতি
(খ) গ্যেটে, অনুবাদের

**অনুশীলনী—২**

১—৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৭. (ক) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে
(খ) প্রথম, ঐতিহাসিক উপন্যাস
(গ) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
(ঘ) As Slow Our Ship
(ঙ) ঋগ্‌বেদের

৮. (ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) অপূর্ব দেশভ্রমণ
(গ) ভাবানুবাদ

## ১০৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি


১. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

২. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত

৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ

# একক ১১০ ❑ অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান

গঠন

১১০.১ উদ্দেশ্য

১১০.২ প্রস্তাবনা

১১০.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদের সমস্যা

১১০.৪ সারাংশ ১

১১০.৫ অনুশীলনী ১

১১০.৬ মূলপাঠ ২ — অনুবাদের সমস্যার সমাধান

১১০.৭ সারাংশ ২

১১০.৮ অনুশীলনী ২

১১০.৯ উত্তরমালা

১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

## ১১০.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করেন, তাহলে আপনি—

- অনুবাদ করতে গেলে যে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সেইসব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অবগত হবেন।

## ১১০.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত বিভিন্ন দিক থেকে যেসব সমস্যার

উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে। এছাড়া কবিতার অনুবাদকালে শিল্পরূপায়ণ এবং ছন্দগত দিক থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাও এখানে বলা আছে। প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, তার কথাও এখানে পাওয়া যাবে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে অনুবাদের সমস্যার নানা ধরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদের সার্থকতার পেছনে পাঠকের যে একটা বড় ভূমিকা থাকে, সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জনা করতে হয়। এইভাবে অনুবাদ করলে অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না, ফলে অনুবাদকের মাধ্যমে মূল রচনার যেন নবজন্ম (transcreation) হয়ে থাকে এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তুও সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পর অনুশীলনীগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

## ১১০.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদের সমস্যা

আগের এককের মধ্যে আমরা অনুবাদের চর্চা কেন করা হয় এবং অনুবাদের নানা প্রকার প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার জন্য যে কয়েকটি উপায় আছে, তার মধ্যে অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য বা পদ্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দেয় নানারকম অভাবিতপূর্ব সমস্যা। এই সমস্যা নানাভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন— ভাষাগত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে, শব্দবিন্যাসের দিক থেকে ইত্যাদি।

এবারে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

অনুবাদকের উদ্দেশ্য যতটা পরিমাণে মূল লেখকের উদ্দেশ্যের সমধর্মী হয়, অনুবাদকের শিল্পপ্রকরণও ততটা পরিমাণে মূলানুগত হয় এবং অনুবাদ হয় সার্থক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার ব্যাপারটি

দেখানো যেতে পারে। তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রথম দিকে পাওয়া যায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনিদের সংলাপ। এ অনুবাদ তাঁর ভাষাশিক্ষার অঙ্গ ছিল, ভাষার চর্চাই ছিল এখানে মুখ্য। যদিও তিনি পুরো 'ম্যাকবেথ' নাটকটিই অনুবাদ করেছিলেন, তবু এই অংশটি ছাড়া বাকিটা লুপ্ত। এই অনুবাদে দেখা যায় শব্দগত দিক থেকে অনুবাদক যথেষ্ট যত্নবান। অনুবাদের কয়েক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—শেক্সপিয়রের লেখাতে রয়েছে : "Give me" quoth I / 'Aroint thee' witch!" the rumpfed ronyon cries. এটাই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে করেছেন এভাবে : চাইলুম তার কাছে গিয়ে / পোড়ামুখী রেগে / 'ডাইনী মাগী, যা তুই ভেগে'....আক্ষরিক শব্দানুবাদ করেননি তিনি। কিন্তু মূল ভাবরূপের নিখুঁত এক অনুবাদ করা হয়েছে এখানে। এর ফলে অনুবাদ হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। ফলে মূল নাট্যরচনার সংলাপের প্রতি অনুবাদকের আকর্ষণ মূল নাট্যকার ও অনুবাদকের উদ্দেশ্যকে এক করেছে।

সুতরাং যেমন মৌলিকরচনায়, তেমনি অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি জরুরি প্রশ্ন হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা ভাষার লেখকের পক্ষে সমস্যাটিকে প্রভাবে দাঁড় করানো যায়— লেখার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম হবে, কাব্যিক রীতি বা পুরোনো ভাষা কোন্ পর্যন্ত প্রশ্রয় পাবে?

দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রতিটি শব্দেরই আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও তার ভাষান্তরিত প্রতিশব্দের একই রকম মিল পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বাক্য রচনাতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার পার্থক্য এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (অর্থাৎ Adjective clause) বাংলায় কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তারপরে আসে বিশেষণ-বাক্যাংশ। যেমন, বাংলাতে বলা হয়—''Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল।" এখানে ''সুন্দরী বালিকা" কর্তৃপদ। ''Rhodopis নামে" তার আগে বসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে তা পরে বসে— "A beautiful girl named Rhodopis" সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে সাধারণত কর্তার কিছু পরে, কখনো বা আগে ক্রিয়াপদ বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরেই বসবে। তা হলে বাক্যটা এরকম হবে "A beautiful girl named Rhodopis was bathing" বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই—আমরা 'জলগুলি' কখনোই বলি না, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে। "A beautiful girl named Rhodopis was bathing in the water of the Nile." 'River' শব্দটি এখানে না দিলেই ভালো হয়।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। যে-কোনো শিল্প অতি জটিল, গভীর, রহস্যময়। যেমন—কবিতার শিল্প। কবি তাঁর আবেগ ও চিন্তাতরঙ্গকে সংহত ও ঘন করে তোলেন রূপগ্রাহ্য

চিত্রে—যাতে কবির বিশিষ্ট অনুভূতির অভিজ্ঞতা অন্য সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। এই 'চিত্র' হল—কবির মনের সকল স্মৃতি-অনুষঙ্গ থেকে নির্মিত 'চিত্রকল্প' (অর্থাৎ, image)। কবিতাটি এই সবের অচ্ছেদ্য সমন্বয় ও সৌষম্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এই শিল্পরূপের অনুসরণ অনুবাদের সার্থকতায় যেমনই মূল্যবান তেমনই সমস্যা-সংকুল। এই ধরণের সমস্যা সাধারণত কবিতার অনুবাদকরাই উপলব্ধি করেছেন।

কবিতার অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। সাধারণত শব্দবিন্যাসে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ঝোঁক' (stress)-এর একটা পার্থক্য থাকে। লাতিন কবিতায় প্রচুর স্বরাঘাত থাকে এবং সে স্বরাঘাতের নানা নিয়মও থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু ইংরেজি পদ্যছন্দে কানে শোনা স্বরের দৈর্ঘ্যের ওপর স্বরাঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য এক ভাষার কবিতার ছন্দকে অন্য ভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে যদি দুটি ভাষার মধ্যে শব্দব্যুৎপত্তি, বিশিষ্ট বাক্‌রীতি, ধাতু ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরেজির সঙ্গে ফরাসি বা জার্মান ভাষার, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের ও বাংলা ভাষার, সেখানে মূল ছন্দ অনুবাদ করা তেমন কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'মেঘদূত' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর আংশিক অনুবাদে আর বিদ্যাপতির দু-একটি পদের অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও দুই ভাষার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য আছে। বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা সমান। অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই বাংলা রীতি অনুসরণ করলে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রক্ষা করা যায় না।

আবার ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের গঠনেও শব্দোচ্চারণ রীতির পার্থক্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এন্ডারসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—''ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই ছন্দসংগীত মুখরিত হইয়া ওঠে ... বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গে অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।'' যেমন এডগার অ্যালান পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার এই দুটি চরণের অনুবাদ।

"Ah, distinctly I remember
It was in the bleak December"

রবীন্দ্রনাথ এভাবে করেছেন,—

''আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাঝে।''

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, ইংরেজি ছন্দটা চৌপদী বলে ধরে একটি ঝোঁকে তিনি চার মাত্রা ধরে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি ছন্দে এভাবে চার মাত্রা ধরা যায় না। তাই ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ঝোঁক বাংলায় নেই বলে—অনুবাদটি মূল কবিতার ধ্বনিরূপ ও ছন্দের প্যাটার্ন রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের বাংলা রূপায়ণ অমিত্রাক্ষর। কিন্তু বাংলা ধ্বনিপ্রবাহে ইংরেজির মতো ঝোঁক না থাকায় ইংরেজি ছন্দের যথার্থ প্রতিরূপ বাংলায় প্রায়শই পাওয়া যায় না। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের প্রতি চরণের শেষে একটি ধ্বনির অনুরণন থেকেই যায়। বাংলা ছন্দে তা পাওয়া যায় না। তাই অনুবাদের সার্থকতার জন্য মূল ছন্দ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা কিছুটা পরিমাণে মেনে নিতেই হবে। আবার পদ্যের অনুবাদ গদ্যে পরিবেশন করতে গেলেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। একটি কবিতার মূল ভাব গদ্যে অনুবাদ করা হলে কবিতার অর্থ, শব্দ রক্ষা করা গেলেও সেখানে কবিতার যে একটা তান আছে, তা পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কোনো ভাষার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদ কখনোই মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। করাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ তাতে রসের উপলব্ধিটাই ব্যাহত হবে। তবে সতর্ক অনুবাদক যদি মূল কবিতার চলনকে অনুবাদে অন্তত কিছুটাও প্রতিধ্বনিত করতে পারেন, তাহলে ছন্দগত পার্থক্যটুকু অনেকটাই কমে আসে। যেমন—

''উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি
থাক নীল শূন্যে।

বিমলচন্দ্র ঘোষের এই কবিতা, ''দুলকি চালের মাত্রাবৃত্ত'' ঃ ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৪, ৪ + ৪ + ৪ + ৩, এই ভাবে চলেছে। এই চলন্‌টাকে ধরেই অনুবাদককে এগোতে হয় এভাবে—

"A glitt'ring group of pigeons
Gliding beneath the sun-rays
Restless wings are gliding
Sapphire cosmos unbarr'd
Let stay Planets and starlets, let stay."

(পল্লব সেনগুপ্ত)

—মূলত চতুর্মাত্রিক (শেষ পর্বে ত্রিমাত্রিক) আয়াম্বিক ছন্দের মাধ্যমে এটা করা গেছে বলেই, মূলের তাল ও সুর দুইই অনেকটা প্রতিফলিত হতে পেরেছে এই অনুবাদে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল প্রতিশব্দের ব্যবহার। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার বহু শব্দ প্রায় একইরকম। তবু অনুবাদ করতে গেলে মূল ভাব সবসময় বজায় রাখা যায় না যে, তা অনুবাদ বিশেষজ্ঞ জে. ও'ব্রায়েন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। টি. এস. এলিয়টের "rats' feet over broken glass" -এর সঠিক ফরাসি অনুবাদ "La course des rats sur les debris de verre." এটি আক্ষরিক ভাবে মূলের অনুবাদ হল না। "La course des rats." মানে ইঁদুরের পা নয়, ইদুঁরের চলা। এখানে "Les pattes" বললে ইঁদুরের পা থাকবে, কিন্তু চঞ্চলতা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম জীবনে "Woodbine"-কে ''মল্লিকা" করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাধনা'-য় হাইনের একটি অনুবাদে ''নীল বায়োলেট নয়ন" বলে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথাও বলতে কবি স্বয়ং যদি তাঁর কোনো লেখার অনুবাদে ব্রতী হন, তাহলেও যে এ-ধরনের কিছু সমস্যা হবে না এমন নয়। ফলত, অন্য কেউ অনুবাদ করতে গেলে, তিনি মূলের প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করবেন (অন্তত করতে চেষ্টা করবেন) সেটা কবি স্বয়ং অনুবাদ করলে সম্ভাব্য নয় যে, তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ।

উদাহরণ হিসেবে দেখুন :

১(ক) ''আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু-দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "At moments when life was too much of sounds
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom."

কবির স্ব-কৃত এই অনুবাদে ''ক্লান্ত প্রাণ" এবং ''জীবনের সমুদ্র সফেন" নিরুদ্দেশ এবং ''দু-দন্ড শান্তি"-র বদলে "wisdom" ব্যবহৃত হয়ে ছবিটাই বদ্‌লে গেল। অথচ, দ্বিতীয় কোনো অনুবাদক এখানে যে রকম করেছেন, তা প্রায় মূলানুগ :

(গ) "I'm a weary soul : the foamy waves of life wafted at large
I had a momentary bliss with Banalata; she came from Natore."

২(ক) ''.... বলেছে সে, এত দিন কোথায় ছিলেন?''

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।''

(খ) "I have also seen her, Banalata Sen of Natore."

মূলে, বনলতার ঐ প্রশ্ন এবং পাখির নীড়ের সঙ্গে উপমিত তার চোখে—এই দুয়ে মিলে যে-বাক্‌প্রতিমা গড়েছে, সেই অনবদ্য ভাবনাটি কবির নিজের অনুবাদে একেবারে নিশ্চিহ্ন! অথচ, অন্য অনুবাদক সেটাকে সাধ্যমতো রাখারই প্রয়াসী হয়েছেন ঃ

(গ) ".....She, lifting her nestling eyes

Asked me, 'Where hast thou been so long, Monsieur?'

She, that Banalata of Natore.'

—''এতদিন কোথায় ছিলেন?'' -এর মধ্যে সম্বোধনের দূরত্ব এবং সম্পর্কের নৈকট্য যেভাবে সমন্বিত আছে, অনুবাদে সেটা মেলানো অত্যন্ত দূরহ; তবু ফরাসি 'মঁসিয়ে' খানিকটা কাছাকাছি যায়, যা ইংরেজি 'স্যার'-এ আসে না। ''নেস্‌লিং আইজ'' ''পাখির নীড়ের মতো চোখ''—এর ভাবানুবাদ; 'নেস্ট-লাইক' বা 'নেস্টলি' করলে—মূলের আরও কাছাকাছি যেত ঠিকই, কিন্তু প্রথম শুদ্ধ হলেও গদ্যময়, দ্বিতীয়টি শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু অশুদ্ধ শব্দ! [(গ) - অংশগুলি পল্লব সেনগুপ্তের অনুবাদ]

আসলে, নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই যে, সেটি 'অনুবাদ' না হয়ে নূতন একটি কবিতায় পরিণত হয়, সেটাই এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এ জিনিস যে হামেশাই ঘটে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং তাঁর নিজের অনূদিত ইংরেজি 'Gitanjali'-যা নিয়ে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

## ১১০.৪ সারাংশ—১

একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় কোনো সাহিত্য অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

অনুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। দুটি ভিন্ন ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের মিলও পাওয়া যায় না। আবার বাংলাতে বিশেষণ বাক্যাংশ যেমন কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে বসে, তারপরে বিশেষণ বাক্যাংশ বসে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরে, কখনো আগে বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। এছাড়া ছন্দগত দিক থেকেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যা দেখা যায়। উচ্চারণ রীতি অনুসারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ঝোঁকের একটা পার্থক্য থাকে। সেজন্য একভাষার কবিতার ছন্দকে অন্যভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়, আবার একটি কবিতাকে গদ্যে অনুবাদ করা হলে, কবিতার যে তান আছে, তাও অনুবাদে পাওয়া যায় না।

## ১১০.৫ অনুশীলনী—১

**নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

**১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) ইংরেজিতে —— কিছু পরে, কখনো বা আগে সাধারণত —— বসে।

(খ) অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল ——।

**২. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) বিশেষণ বাক্যাংশ বাংলায় ব্যবহৃত হয় কর্তৃপদের—

(১) আগে

(২) পরে

(৩) সঙ্গে।

(খ) বাংলায় ক্রিয়াপদ বসে বাক্যের —

(১) আগে

(২) শেষে

(৩) মাঝে।

৩. অনুবাদকালে কী-কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে, তা বর্ণনা করুন। কীভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও দেখান।

৫. অনুবাদের সময়ে মূলের কোনো শব্দ বা চিত্রকল্পকে হুবহু ভাষান্তরিত না-করা গেলে, কী করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়?

৬. লেখক স্বয়ং অনুবাদে ব্রতী হলে কী ধরনের সমস্যা ঘটিতে পারে তার আলোচনা করুন।

## ১১০.৬ মূলপাঠ ২ — অনুবাদের সমস্যার সমাধান

অনুবাদের যেমন নানা প্রকার সমস্যা আছে, তেমনি সেই সমস্যার সমাধানও আছে।

অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ পাঠক। সচরাচর তাঁরা মূল রচনার ভাষার সঙ্গে অপরিচিত, মূল রচনার দেশ-কাল-পরিবেশ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাঁরা অনুবাদে উপভোগ্য রস চাইবেন। তাই অনুবাদক যখন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা কোনো সাহিত্যকে অনুবাদ করতে যান, তখন যদি তিনি তার মধ্যে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে সেই অনুবাদ পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে। এই সমস্যার সমাধানে অনুবাদককে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করতে হয়—তা হল গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা, বার্নসের ''ও ফিলি'' কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যায়—

''The Woodbine in the dewy wit''
''শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত''

উদাহরণটিতে ''Woodbine'' পরিণত হয়েছে ''মল্লিকা''-য়। কারণ ''মল্লিকা'' নামটি বাঙালি পাঠকের অনেক কাছাকাছি। ''wit''-এর বিকল্পে 'হাসিত' শব্দটি নতুন গ্রহণ হয়েছে। এই গ্রহণ মূল অর্থকে বিঘ্নিত না করেই পরিমার্জনা করা হয়েছে।

একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রতিটি শব্দের অবস্থান, অনুক্রম, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বন্টন, সবকিছুই একটা ঐক্যসুষমায় বিধৃত থাকে। যেমন একটি বিদেশি ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদও কখনো পরিপূর্ণভাবে মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। তখন অনুবাদকের কল্পনাশক্তি ও কাব্যচেতনা, যতটা সম্ভব শব্দের পরিমার্জনা বা নতুন শব্দ প্রয়োগের উপায়কে গ্রহণ করে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের কল্পনাশক্তি, নতুন শব্দ প্রয়োগ মূল কবির কাছাকাছি হলে, শব্দের গ্রহণ, বর্জনের মধ্যে দিয়েও মূল কবিতার ভাব; রূপ, রস লাভ করা যায়।

তাই পাঠক মনোরঞ্জনই সবসময় অনুবাদের মূল লক্ষ্য নয়। অনুবাদক একটি রচনা পড়ে যে-আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দ-ই তাঁকে অনুবাদকর্মে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের মধ্যে উদ্দেশ্যের বিরোধিতা থাকে না, আবার পাঠকের সঙ্গে যেটুকু বিরোধ, তাও গৌণ হয়ে যায় এবং তখনই অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

অনুবাদচর্চায় অনুবাদকের উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদের সার্থকতার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু, রসরিক্ত।

২. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা না থেকেও কিছু ভিন্নতা থাকলে অনুবাদে মূলানুগত্যের দিকে যত্ন হয় কম, যদিও অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও রসের উপভোগই প্রধান হলে — অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের একপ্রাণতা ঘটলে অনুবাদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশজ সংস্কার রক্ষা করেও যথাসম্ভব মূলানুগত্য এবং রচনার সার্বিক সৌন্দর্য রক্ষা সম্ভব হয়।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করার সময়, লেখায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম থাকবে, সেই সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, এখন আমরা পুরোপুরি বাংলাতেই লিখে থাকি, অর্ধেক সংস্কৃতে নয়, — সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় অনেক কমে গেছে, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লোপ পেয়েছে, যতি-চিহ্নের প্রয়োগ অনেক বেড়েছে এবং শব্দব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেড়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে তাই আধুনিক বাংলার পাশাপাশি 'অম্বু', 'অম্ভোজ' — ইত্যাদি শব্দ যা আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত, তাও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 'যুবতী-জল-কেলি-সৌরভ' ইত্যাদি দীর্ঘ সমাসও ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি 'যবে', 'পুন' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দ, 'ললনা', 'অঙ্গনা', 'প্রমদা' ইত্যাদি প্রতিশব্দও অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে খাঁটি বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণে অনুবাদটি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শব্দ — যাদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত—ব্যবহার করেছেন। বরং বিষ্ণু দে অনুবাদে প্রচলিত—এমনকী লৌকিক বাক্‌রীতি-নির্ভর শব্দও প্রয়োগ করেছেন অনেক সময়। এই সূত্রে বলি : সুধীন্দ্রনাথের 'প্রতিধ্বনি', বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল', 'এলিয়টের কবিতা', বুদ্ধদেবের 'শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা', 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা', 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হুইটম্যানের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'Book of Bengali Verse'-ইত্যাদি বই গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য কাব্যানুবাদ সংগ্রহ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদচর্চার আদর্শ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তার থেকেই অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের কয়েকটি সমাধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল, —

(১) বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদচর্চা একান্তই প্রয়োজনীয়। তবে বিদেশি স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্য — স্বদেশের স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই অনুবাদককে দেশের পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য করে অনুবাদের পরিমার্জনা, পরিবর্তন করতে হবে।

(২) মূল রচনার স্থান ও ব্যক্তিনাম অনুবাদে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু চরিত্র, মূলভাব ও মূলকাহিনি যথাসাধ্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তবে স্বয়ং হেমচন্দ্রই যে, রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনিতে কলকাতার গড়ের মাঠের উল্লেখ করেছেন, তেমন রূপান্তরণ আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

(৩) যথাযথ অনুবাদের জন্য, অনুবাদকে উন্নত করার জন্য অনুবাদক স্থানে-স্থানে নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন।

অনুবাদের সময় অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে যখন প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকে না, তখনই সার্তক অনুবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার প্রভাব অনুবাদকের মনকে যেমন উদ্দীপ্ত করে, তেমনি সমকালীন পাঠকের সাহিত্য-মানসেও তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সমকালীন পাঠকের দাবী ও সংস্কারের সঙ্গে অনুবাদকের সম্ভাব্য বিরোধগুলি যথাসম্ভব অতিক্রান্ত হলে—অনুবাদকের ভাব ও রূপের আস্বাদন সমকালীন পাঠকের কাছে নতুন এক সাহিত্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতীত হয়ে ওঠে। সূক্ষতরভাবে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে, যাঁরা নতুন ভাবস্পন্দন ও রসের সন্ধান করেন। অনূদিত সাহিত্য অনুবাদের ভাষার সাধারণ অনুষঙ্গ ও ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে অন্বিত হলে উন্মেষশীল সাহিত্য নির্মাতাদের প্রভাবিত করে; সাহিত্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিক নির্মাণে, শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা, তাঁদের সাহিত্য চেতনায় এনে দেয়। সামগ্রিকভাবে এক নতুন ভাব-ঐশ্বর্য সেই ভাষার সাহিত্যে সংযোজিত হয়।

অনুবাদের বৃহত্তর সার্থকতা এই যে, তা সার্বিকভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, এক নতুন সৌন্দর্যের জগৎ সেই ভাষাভাষী পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। যে-রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, সার্থক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তার অভিনব আবির্ভাব আমাদের নান্দনিক-চৈতন্যকে পরিপূর্ণভাবে ঋদ্ধিমান করে তোলে।

## ১১০.৭ সারাংশ—২

সাধারণ পাঠকরাই একটি অনুবাদের সাফল্যের বিচার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই অনুবাদক যদি অনুবাদে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে তা পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। তখন অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে, এজন্য অনুবাদকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করতে হয়।

তবে সবসময় শুধু পাঠকই কোনো অনুবাদের মূল লক্ষ্য নন। অনুবাদক একটি রচনা পাঠ করে যে-আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাই তাঁকে অনুবাদ করতে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। কারণ মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু।

তবে আদর্শ অনুবাদের সার্থকতা এই যে, তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নান্দনিক চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

## ১১০.৮ অনুশীলনী—২

**নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তরশেষে, প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

**১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ ——।

(খ) অনুবাদের সময় অনুবাদক ও —— মধ্যে যখন বিরোধ থাকে না, তখন —— নবসৃষ্টি হয়ে থাকে।

**২. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় —

(১) কমেছে

(২) বেড়েছে

(৩) একইরকম আছে

(খ) শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করেছেন—

(১) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) বুদ্ধদেব বসু

৩. অনুবাদকালে কৃত সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪. অনুবাদ কীভাবে এক নতুন ধরণের শিল্প হয়ে উঠতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

## ১১০.৯ উত্তরমালা

**অনুশীলনী—১**

১. (ক) কর্তার, ক্রিয়াপদ।

(খ) শিল্পরূপায়ণের।

২. (ক) আগে

(খ) শেষে

৩ এবং ৪ সংখ্যাক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৫ এবং ৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য '২, ৩' অংশের শেষ দিকের অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পড়ুন।

**অনুশীলনী—২**

১. (ক) পাঠক।

(খ) রচনাকারের, অনুবাদের।

২. (ক) কমেছে।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

## ১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি


১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — অনুবাদচর্চা (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪ খণ্ড);

২. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ;

৩. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত;

৪. পল্লব সেনগুপ্ত — অনুবাদের ভাষা : কবিতার অনুবাদ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৯০;

৫. মঞ্জুভাষ মিত্র — আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব।

# একক ১১১ ❑ রূপান্তর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি — মূল ও অনুবাদ

গঠন

১১১.১ উদ্দেশ্য

১১১.২ প্রস্তাবনা

১১১.৩ মূলপাঠ ১ — রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

১১১.৪ সারাংশ ২— গীতাঞ্জলি : মূল ও অনুবাদ

১১১.৫ সারাংশ

১১১.৬ অনুশীলনী

১১১.৭ উত্তরমালা

১১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

## ১১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করলে আপনি, —

- সাহিত্যের রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবেন।
- 'গীতাঞ্জলি'-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- 'Gitanjali' গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পত্রপত্রিকার মতামত সম্পর্কে আপনারা অবগত হবেন।

## ১১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে মূলপাঠ-১ আলোচনা করা হয়েছে রূপান্তরের বিভিন্ন যেসব প্রক্রিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় সে-সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব 'Gitanjali' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, 'Gitanjali' সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত মতামতও এখানে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দুটি কবিতা ধরে এখানে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে এজরা পাউন্ডের মতামত এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করুন। তাহলে আপনি রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে যেমন ধারণা করতে পারবেন, তেমনি তার বিষয়ে আলোচনাও করতে পারবেন। বিষয়বস্তুটি সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পরে অনুশীলনীর উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

## ১১১.৩ মূলপাঠ ১—রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

সাহিত্যিকগণ অনেক সময় তাঁদের রচনার মূল, প্রাচীন রচনা থেকে নিয়ে নিজের প্রয়োজনে এবং রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নতুন অর্থ আরোপ করে থাকেন। একে রূপান্তর বলা যেতে পারে। এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরোনো কাহিনি স্বকীয় হয়ে ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে, সাহিত্যিকগণ একটি ভাষার রচনাকে আরেকটি ভাষায় অনুবাদ করে থাকেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামতো মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জন করতে পারেন।

রূপান্তর-প্রক্রিয়া এত ব্যাপকভাবেও হতে পারে যে, মূল এবং রূপান্তরিত অংশের তুলনা করলে বহু সময়েই দুটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে। যেমন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' নাটক দুটি, এর পাশাপাশি রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি রচনার অনেক'টি রূপও পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদের প্রক্রিয়া এত ব্যাপকভাবে কখনোই হতে পারে না যে, মূল রচনা এবং অনুদিত রচনা দুটিকে পৃথক রচনা বলে মনে হবে।

রূপান্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যেমন—উপন্যাস থেকে নাটক, গল্প থেকে নাটক, কাব্যকবিতা থেকে নাটক, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক ইত্যাদি। অনুবাদেরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ করি। যেমন—আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ইত্যাদি।

অনুবাদ করার সময়ে সাহিত্যিকদের একটি বড় দায়িত্ব থাকে। সাধারণভাবে প্রত্যেক সাহিত্যপাঠকের পক্ষে অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে একটি দেশের সাহিত্য অন্য সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে চিন্তাভাবনা এবং সৃষ্টিকর্মে দক্ষতা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু রূপান্তর করার সময় সাহিত্যিকদের তেমন কোনো বড় দায়িত্ব থাকে না।

## রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

আমাদের পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ভূ-স্তর বর্তমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় বর্তমান আকারের অন্তরালে নানা সংস্কার-সংশোধনের ইতিহাস রয়ে গেছে। এই সংস্কার-সংশোধনের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে অভিনয়কালে ব্যবহৃত কপিতে কবিকর্তৃক সংশোধনে আবার কখনো বা পাণ্ডুলিপিতে।

এই রূপান্তর বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন—গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক, কাব্যকবিতা থেকে নাটক, গদ্যনাটকের রূপান্তর, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক, গীতিনাট্যে-নৃত্যনাট্যে রূপান্তর, ভাষান্তরকালীন রূপান্তর ইত্যাদি।

প্রথমেই আমাদের আলোচনার বিষয় গল্প থেকে নাটকের রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'মুকুট' নামে বড় গল্পটিকে তিনি 'মুকুট' নাটকে রূপান্তর করেছিলেন। বড়গল্পটিতে এগারোটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্ট অংশ আছে; আর নাটকটিতে আছে তিনটি অঙ্ক এবং বারোটি দৃশ্য। গল্পটি ট্র্যাজেডিমূলক, আর নাটকটি মিলনাত্মক। এর পরবর্তী গল্প 'শেষের রাত্রি'। যা থেকে রূপান্তরিত হয়ে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি রচিত হয়েছিল। গল্পের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশগুলিকে ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের বহুলতার দ্বারা এক-একটি নাটকীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'কমফল' গল্পটির নাট্যরূপের নাম 'শোধবোধ'। গল্পটি পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেছে। গল্পটিতে নাটকের মতোই পরিচ্ছেদের ভাগ করা হয়েছে, তাই গল্পটিকে নাটক রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কষ্ট হয়নি। গল্পে বর্ণিত ভাদুড়ি পরিবার নাটকে লাহিড়ি পরিবার হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নলিনীর জন্মোৎসব বিবরণ সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। পরবর্তী একটি 'আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকটি রচনা করেছিলেন। গল্প থেকে নাটকটির রূপান্তর শুধু রূপান্তর নয়, যেন নবজন্ম হয়েছে।

গল্পটি হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় এবং পরিণয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। নাটকে তা পাওয়া যায় না। তবে নাটকটিতে তীব্রধার ব্যঙ্গ পাওয়া যায়, যা গল্পটিতে একেবারেই অনুপস্থিত। নাটকের শেষে যে সংস্কারের বন্ধনমুক্তি এবং নবজীবনের উদ্‌ভাস দেখানো হয়েছে, তা গল্পে আদৌ ছিল না। নাটকটির মধ্যে গানগুলি নতুন যোগ হয়েছে। 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে 'মুক্তির উপায়' নাম দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। গল্পে কোনো গুরুর অস্তিত্ব না থাকলেও, নাটকটিতে গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে।

এরপরে আমাদের আলোচ্য, উপন্যাস থেকে নাট্যরূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের উপন্যাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেই নাটক রচনা করেছিলেন। এখানে প্রথম আলোচ্য উপন্যাস হল 'বউঠাকুরানীর হাট'; এই উপন্যাসটির নাট্যরূপের তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। উপন্যাসটির নাট্যকৃত রূপসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ''মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।'' কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবেই নাটকের দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটি নতুন। এই ধনঞ্জয় চরিত্রকে আমরা আবার পাই প্রায়শ্চিত্তের নবরূপ 'পরিত্রাণ' নাটকে। পরবর্তী 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশকে 'বিসর্জন' নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের কাহিনি নাটকে অনুপস্থিত। উপন্যাসে যে ঐক্য ও সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়, নাটকে সেই ঐক্য ও সংহতি এমন এক রূপ লাভ করেছে যে তার ফলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসের নাম 'রাজর্ষি' হওয়ায় উপন্যাসে ঋষিকল্প রাজা গোবিন্দমাণিক্য গুরুত্ব পেয়েছিল, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শেষে আত্মবিসর্জন দেওয়া প্রধান হওয়ায় জয়সিংহ-ই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। নাটকে নতুন চরিত্রগুলি হল চাঁদপাল, নয়ন রায়, গুণবতী, অপর্ণা ইত্যাদি। এছাড়া এখানে আছে ভাষাগত রূপান্তর। ভাষাগত পরিবর্তন দুভাবে হয়েছে। প্রথমত, যেখানে 'রাজর্ষি'র গদ্যসংলাপকে 'বিসর্জন'এও গদ্য রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে 'রাজর্ষি'র গদ্য সংলাপকে বিসর্জন'এ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ করা হয়েছে।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' নামক প্রহসনে রূপান্তরিত করেছেন। প্রথমে উপন্যাসটির নাম 'চিরকুমার সভা'-ই ছিল, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। উপন্যাসটি নাটকের মতোই সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে লেখা হয়েছিল এবং নাটকের দৃশ্যের মতোই উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি বিভক্ত। কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বহিরঙ্গে 'আধানাটক' হলেও, অন্তরঙ্গে তা কিন্তু উপন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়।

এবারে কবিতা থেকে নাটকের রূপান্তরের বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। 'কবিকাহিনী'র সঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর সঙ্গে 'নলিনী' নাটকের গভীর সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, এগুলি একই কাহিনির রূপান্তর। 'কবিকাহিনী' কাব্য, 'ভগ্নহৃদয়' নাটকাকারে কাব্য আর 'নলিনী' সম্পূর্ণভাবে নাটক। 'কবিকাহিনি' এবং 'ভগ্নহৃদয়' পদ্যে লেখা এবং 'নলিনী' গদ্যে লেখা হয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়'-এ অনিল ও ললিতার উপকাহিনী নতুন রচনা, যা 'নলিনী'তে বর্জিত হয়েছে। নাটকে কবির নাম হয়েছে নীরদ, ভগ্নহৃদয়ে মুরলা হয়েছে নীরজা। 'পূজারিণী' কবিতার বিষয় অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা' নাটকটি রচনা করেন। কবিতা এবং নাটকের গল্প মূলত এক। কবিতাতে শ্রীমতীর পূজা নিবেদনের উদ্যোগ দেখে বধু অমিতা এবং রাজকুমারী শুক্লার বিপরীত প্রতিক্রিয়া নাটকে নন্দা অজিতা ভদ্রা, বাসবী এবং রত্নবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখানে বলা যেতে পারে কবিতার কাহিনিটুকু নিয়ে নাটকটি লেখা হলেও, তা সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা।

এবারে আমাদের আলোচনার বিষয় পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। 'রাজা ও রানী' পদ্যনাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নামক গদ্যনাটকে রূপান্তর করেছিলেন। পদ্যনাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত। 'রাজা ও রানী' নাটকে কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত যে লিরিকের প্লাবন এনেছিল 'তপতী' নাটকে সেই প্রেমের প্রতিধ্বনি নরেশ-বিপাশার প্রেমের উপাখ্যানে পাওয়া যায়। তবে তাতে গদ্যনাটকটিতে লিরিক ভাবরসের উপস্থিতি একটু কম হয়নি। 'রাজা ও রানী'-তে সাতটি এবং 'তপতী-তে মোট দশটি গান আছে। 'রাজা ও রানী'-র সংলাপ অমিত্রাক্ষরে লেখা হলেও তার মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে, 'তপতী' গদ্যে লেখা হলেও তার মধ্যে সেই নাটকীয়তা লক্ষ করা যায় না।

'রাজা ও রানী' থেকে 'তপতী'-তে রূপান্তর শুধু ভারতীয় প্রত্যাবর্তন নয়। এই পরিবর্তন শেক্সপিয়র থেকে স্বকীয়তায় ফিরে আসা। 'রাজা ও রানী' নাটকে শেক্সপিয়রের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। যেমন রেবতী নিঃসন্দেহে লেডি ম্যাকবেথের প্রতিচ্ছবি। 'তপতী'-তে এই চরিত্রটি পরিত্যক্ত হয়েছে। 'রাজা ও রানী' নাটকে বিক্রমের অনুতাপের হাহাকারে যেখানে নাটক শেষ হয়েছে, 'তপতী' নাটকে সেখানে এক সুদূর অমৃতালোকের বিভায় নাটক শেষ হয়েছে।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। প্রথমেই আমাদের আলোচ্য 'গোড়ার গলদ' নাটক থেকে দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর পরে 'শেষরক্ষা' নাটকের রূপান্তর শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই রূপান্তর করেছিলেন। মূল নাটকে পাঁচটি অঙ্কে কুড়িটি দৃশ্য ছিল, রূপান্তরিত

নাটকে সেখানে চারটি অঙ্ক, সাতটি দৃশ্য আছে। সংলাপও যথাসম্ভব লঘু হয়েছে। যেমন 'গোড়ায় গলদ'-এর চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে বিনোদবিহারী পনেরোটি বাক্য নিয়ে দীর্ঘ সংলাপ 'শেষরক্ষা'তে তিনটি বাক্যেই শেষ হয়েছে। তবে কয়েকটিক্ষেত্রে তা দীর্ঘও হয়েছে। এর পাশাপাশি 'গোড়ায় গলদ' নাটকে আছে একটি গান, আর 'শেষরক্ষা'তে আছে দশটি গান। 'শারদোৎসব' গদ্যনাটকটিকে 'ঋণশোধ' নামক গদ্যনাটকে রূপান্তর করা হয়েছিল। ১৯২১ সালে 'শারদোৎসব' নাটকের রূপান্তরিত রূপ রচিত হয়। রচনাবলীতে জানানো হয়েছে দুই নাটকের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখর চরিত্রের সন্নিবেশ। 'শারদোৎসব' নাটকে শরৎ প্রকৃতির আগমনের মধ্যে দিয়ে ধরণীর যে-আনন্দ প্রকাশিত তার অন্তরালে যে-তত্ত্বকথা লুকানো ছিল, তাই 'ঋণশোধ' নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। রূপান্তরিত নাটকে শেখর চরিত্রের প্রাধান্যের জন্য সম্রাট বিজয়াদিত্য ও ঠাকুরদার গুরুত্ব কমে গেছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির দুটি রূপান্তর পাওয়া যায় 'মুক্তধারা' এবং 'পরিত্রাণ'। 'মুক্তধারা' নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছিলেন—নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় এবং তার কথোপকথনের খানিকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে নেওয়া। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে যে-প্রজাবিদ্রোহের কাহিনি ছিল, তাই 'মুক্তধারা' নাটকে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। 'মুক্তধারা'-র রণজিৎ ও বিভূতি-কে একত্রে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর প্রতাপ বলা যেতে পারে। নাটকটির ঘটনাবলী 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মতো নানা জায়গায় ঘটেনি, সব ঘটনাই এখানে ঘটেছে পথ! 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে পারিবারিক কাহিনিই প্রধান ছিল, সেই পারিবারিক কাহিনি নিয়েই গড়ে উঠেছিল 'পরিত্রাণ' নাটকটি। মূল নাটকের একাধিক ছোট ছোট দৃশ্যগুলি একসঙ্গে যোগ করে রূপান্তরিত নাটকের দৃশ্যগুলি দীর্ঘ করা হয়েছে। 'পরিত্রাণ' এর গদ্যসংলাপ 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে অবিকৃত ভাবে এসেছে। পরবর্তী আলোচ্য নাটক 'রাজা'। এই নাটকটির তিনটি রূপান্তরিত রূপ পাওয়া যায়। 'অরূপরতন', 'শাপমোচন কবিতা' এবং 'শাপমোচন কথিকা'।

প্রথমেই আসা যাক 'অরূপরতন' নাটকটির প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'অরূপরতন' নাটকটি 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। 'রাজা' নাটকে রাজাকে দেখা না গেলেও তার ভূমিকা অপ্রধান নয়। কিন্তু 'অরূপরতন' নাটকে রাজার ভূমিকা একেবারে বাদ গেছে। 'রাজা' নাটকের শেষে ''আমরা অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আশার ভয়ানককে'' সুদর্শনা প্রণাম করেছিল। আর 'অরূপরতন' নাটকে প্রণামের পরেও আছে গান, 'শাপমোচন'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে 'রাজা' নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল।'' 'শাপমোচন'-এ মূল ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছে, 'রাজা' ও 'অরূপরতন'-এর মতো এখানে নারী নয়, পুরুষই প্রিয়মিলনের জন্য উৎসুক হয়েছে। কবিতা থেকে কথিকায়-তথা-নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে ঊনত্রিশটি নৃত্য সহযোগে গান ব্যবহৃত হয়েছে। মোটের ওপর 'শাপমোচন' গদ্যকবিতার রূপান্তর শাপমোচন গদ্যকথিকা।

‘গুরু’ নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি গুরু নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।’’ ‘অচলায়তন’ নাটক যেখানে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকে সংলাপের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে, ‘গুরু’ নাটকে বালকদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। ‘অচলায়তন-এর পরিহাসপ্রাধান্য থেকে ‘গুরু’-তে আধ্যাত্মিক সত্যরূপায়ণের প্রবণতা—এই পরিবর্তনের জন্যই নাটকটির রূপান্তর করা হয়েছে। মূল নাটকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে রাজার প্রবেশ, দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোনপাংশুদের আক্রমণ সংবাদ, ‘গুরু’ নাটকে সুভদ্র-উপকাহিনির পরে যুক্ত হয়েছে। শোনপাংশুরা রূপান্তরিত নাটকে হয়েছে সূনক। অচলায়তনের পঞ্চক দৃশ্য হয়েছে গুরুর চতুর্থ দৃশ্য। ‘গুরু’ নাটকের শেষ গান ‘‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়’’ ‘অচলায়তন’-এ ব্যবহৃত হয়নি।

এবার আসা যাক গীতিনাট্যের রূপান্তর-এ। প্রথমে আলোচনা করা ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ ও ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্য নিয়ে। দুটি নাটকই কবির পারিবারিক সাঙ্গীতিক পরিবেশের ফল এবং যৌথ রচনা ‘বাল্মিকী প্রতিভা’-র প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমানে প্রচলিত ‘বাল্মীকি প্রতিভা’-র রূপান্তর হয়েছে এবং সেই রূপান্তরকালে ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যের উপকরণ ‘বাল্মীকি প্রতিভা’য় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের প্রথম দস্যুর ‘‘আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ’’ গানের আগে দ্বিতীয় সংস্করণে বনদেবীদের গান এবং প্রথম দস্যুর ‘‘আঃ বেঁচেছি এখন’’ গান যুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি বালিকারূপিণী সরস্বতী ‘‘এ কী ঘোর বনে’’ গান গেয়ে প্রবেশ করেছে প্রথম সংস্করণে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এর আগে বালিকাকণ্ঠে ‘‘ওই মেঘ করে বুঝি গগনে’’ গানটি যুক্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের তৃতীয় দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ‘‘ব্যাকুল হয়ে বনে বনে’’ গানটি সম্পূর্ণ নতুন গান। এই সংস্করণেরই চতুর্থ দৃশ্যে দস্যুদের শিকারবৃত্তান্ত কিছুটা নতুন করে লেখা, আর কিছুটা ‘কালমৃগয়া’-র রূপান্তর। পরবর্তী আলোচিত গীতিনাট্যদ্বয় ‘নলিনী’ ও ‘মায়ার খেলা’। রবীন্দ্রনাথ ‘মায়ার খেলা’ রচনাকালে কাহিনিগত উপকরণ যেমন ‘নলিনী’ থেকে নিয়েছেন, তেমনি তার পূর্বরূপ ‘ভগ্নহৃদয়’ থেকেও নিয়েছেন। ‘ভগ্নহৃদয়ে’র নায়ক কবির নাম নেই, ‘নলিনী’তে তার নাম নীরদ, ‘মায়ার খেলা’-তে সেই হয়েছে অমর। তবে ‘মায়ার খেলা’ গীতিনাট্যে ‘ভগ্নহৃদয়’ বা ‘নলিনী’ থেকে ভাষা রূপান্তরিত করে গ্রহণ করা হয়নি।

গীতিনাট্যের পর নৃত্যনাট্যের রূপান্তরের প্রসঙ্গ। ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাট্যকাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। নাট্যকাব্যে সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন আগে দেখেছে, নিজের মধ্যে রূপলাবণ্যের আবির্ভাবে চিত্রাঙ্গদার বিস্ময়ের বর্ণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু নৃত্যনাট্যে পুরো ঘটনাটাই বিপরীত হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’। নৃত্যনাট্যের প্রথমে ‘অস্পৃশ্যা’ প্রকৃতি—দইওয়ালা,

ফুলওয়ালি, চুড়িবিক্রেতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তা গদ্যনাট্যে পাওয়া যায় না। গদ্যনাটকের মোট চারটি গান নৃত্যনাটকে গৃহীত হয়েছে এবং এগারোটি গান পরিত্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নৃত্যনাট্য হল 'শ্যামা'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্যকাহিনিটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে।' 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য এই 'পরিশোধ'-এরই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ। কবিতাটিতে উত্তীয় চরিত্রটিকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু নৃত্যনাট্যে উত্তীয় উপস্থিত হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। রূপান্তরকালে নৃত্যনাট্যে বহু অংশ যোগ হয়েছে, ফলে তার আয়তনও অনেক বেড়েছে।

এবারে আলোচনা করব নাট্যরূপান্তর প্রসঙ্গে। 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটকটি প্রথমে 'রথযাত্রা' নামে প্রকাশিত হয়। দুই রূপের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। 'রথযাত্রা' নাটকে রথই প্রধান। রথই 'সমাজ'! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন সমাজকে যে-শক্তি গতি দেয় তার ওপর। সমাজরথকে যে রশি গতি দেবে, 'রথের রশি' নাটকে সেই শক্তির কথাই বলা হয়েছে। 'রথযাত্রা' নাটকে যেমন পুরুষদের প্রাধান্য 'রথের রশি' নাটকে তেমনি নারীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 'রথের রশি' নাটকের সন্ন্যাসীকেও 'রথযাত্রা' নাটকে পাওয়া যায় না। দুই নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য 'রথযাত্রা' নাটকটি গদ্যে এবং 'রথের রশি' নাটকটি গদ্যছন্দে লেখা।

রূপান্তরের আলোচনায় আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় ভাষান্তরকালীন রূপান্তর। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব 'চিত্রাঙ্গদা' এবং তার রূপান্তর 'Chitra' নিয়ে। পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত 'Chitra' 'চিত্রাঙ্গদা'-কে অনুসরণ করলেও, 'চিত্রাঙ্গদা'-র ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্য মিলে 'Chitra'-র ষষ্ঠ দৃশ্য রচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি 'Chitra'-তে মূলের সপ্তম দৃশ্য নেই, দশম দৃশ্য সপ্তম দৃশ্যে, নবম-অষ্টম দৃশ্যে এবং একাদশ-নবম দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। মূলের অনেক সংলাপ যেমন রূপান্তর-এ নেই, তেমনি অনেক সংলাপ সংক্ষিপ্তও হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং তার অনুবাদ 'Sanyasi or the Ascetic'। মূল নাটকের ষোলোটি দৃশ্য অনুবাদে চারটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। আবার অনেক অংশ তিনি নতুন ভাবে সংযোজনও করেছেন। মূলে অস্পৃশ্যা রঘুর মেয়ের কোনো নাম না থাকলেও, রূপান্তরে তার নাম হয়েছে Vasanti। নাটকে প্রধান দুটি চরিত্র থাকলেও এদের আশেপাশে অসংখ্য চরিত্র এসেছে, রূপান্তরে সেই চরিত্রগুলির সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। এরপরে আলোচনা করব 'মালিনী' ও তার রূপান্তর 'Malini' নিয়ে। মূলে সংলাপ পয়ারে লেখা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে তা গদ্যে লেখা হয়েছে। 'মালিনী' নাটকে চারটি দৃশ্য ছিল 'Malini'-তে তা দুটি অঙ্কে পরিণত হয়েছে। 'Malini'-তে কাশ্যপ চরিত্র, সেনাপতি চরিত্র বর্জিত হয়েছে।

এরপরে আসুন আমরা আলোচনা করি 'বিসর্জন' ও 'Sacrifice' নিয়ে। 'বিসর্জন' লেখা হয় ১৮৯০ সালে, আর তাকে 'Sacrifice'-এ অনুবাদ করা হয় ১৯১৭ সালে। মূলের অনেক অংশই অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। ভাষান্তরকালীন রূপান্তরের আলোচনায় আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য নাটক 'রাজা ও রানী' ও 'The King and the Queen'। মূলের পাঁচটি অঙ্কের তিরিশটি দৃশ্য রূপান্তরে দুটি দৃশ্য ভাগহীন অবিচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত। অনেক চরিত্র, সংলাপ অনুবাদে বাদ গেছে। উচ্চারণে সুবিধার জন্য গোবিন্দমাণিক্য হয়েছে Govinda, বিক্রমদেব হয়েছে Vikram. শিলাদিত্য ও যুধাজিৎ হয়েছে Sila ও Ajit। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের কোনো দৃশ্যই রূপান্তরে গ্রহণ করা হয়নি। রূপান্তরে ইলার উক্তি, "King, I hear the bridal music, Where is my lover? I am ready" মূলে পাওয়া যায় না। সেখানে ইলা ''একী! একী! মহারাজ, কুমার আমার" বলে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

## ১১১.৪ মূলপাঠ — ২ গীতাঞ্জলি ঃ মূল ও অনুবাদ

পূর্বোক্ত মূলপাঠে আপনারা রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরকালীন অনুবাদ সম্পর্কে জেনেছেন। তাঁর ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ। মনের কোনো এক বিচিত্র খেয়ালে তিনি তাঁর লেখা কিছু কবিতা ও গান ইংরেজিতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। এই অনুবাদের মধ্যে দিয়েই তিনি ব্রিটেনের সাহিত্যমহলে পরিচিত হয়েছিলেন।

'গীতাঞ্জলি'-র জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নোবেল কমিটিতে উঠল, তখন ইউরোপের খুব স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ছাড়া তাঁর নাম কেউই প্রায় শোনেননি। এই নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর পাশাপাশি আনাতোল ফ্রাঁস, টমাস হার্ডি, প্রমুখ আঠাশজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নাম ছিল। হার্ডির নাম যেখানে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর সাতানব্বই জন সদস্যের সকলেই সুপারিশ করেছিলেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেছিলেন মাত্র একজন। রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল কমিটির কাছে সমর্থন করাতে রবীন্দ্র-সমর্থকদের যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয়েছিল। কমিটির অন্যতম সদস্য পের অগাস্ট লিওনার্ড হ্যালস্ট্রম রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে একজায়গায় বলা হয়েছিল, — "The small collection of poems creates such a surprisingly rich and genuinely poetic impression that there is nothing odd or absurd in the proposal to reward it even with such a distinction as it is a question here"। এই সময় নোবেল কমিটির অন্যান্য সদস্যরা আরো একবছর অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আবার অনেকে মূল কবিতা অর্থাৎ বাংলা

কবিতা সম্পর্কে আরো কিছু ধারনা করতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটে গেল সেই অভাবিত ঘটনা। চরম রায় দিলেন কার্ল গুস্তাভ ভের্নের ভন হাইডেন্‌স্ট্যাম। পুরস্কার পেলেন প্রায় নাম-না-জানা, অচেনা এক ভারতীয় কবি।

এর আগেই ইন্ডিয়া সোসাইটির সংবর্ধনা সভায় (১০ জুলাই, ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি জানি আমাদের ভাষা আলাদা, আচরণও এক নয়; কিন্তু হৃদয়ের গভীরে আমরা সবাই এক। ....পুব, পুবের মতো—পশ্চিম, পশ্চিম-ই। ....কিন্তু, সখ্য, শান্তি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে দুয়ের মিলন হোক।" তিনি আজীবন পূর্ব-পশ্চিমের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এক ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় 'দ্য ট্রায়াম্ফ অব আর্ট ওভার সারকামস্ট্যানসেজ'—এই শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। যেখানে যা বলা হয়েছে, তার মূল কথা : ''শিল্পই হল পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম .... শিল্প মানুষের মন থেকে মনান্তরে অনুভূতি পৌঁছে দেয়।" 'অনুবাদ' এমনই এক শিল্পমাধ্যম যার সাহায্যে এক দেশীয় সাহিত্যিকের জীবন ভাবনা, বোধ অন্যদেশীয় পাঠকের মনে এক বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার করে দেয়। ঐ সম্পাদকীয়তেই কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ''..... অনুবাদ যতই ভালো হোক না কেন, ভালো কবিতার সৌন্দর্যের অনেকখানি অনুবাদে হারিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠকের, কবিতার অন্তর্গত প্রতিপাদ্য বিষয় খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। মিস্টার টেগোর তাঁর নিজের অনুবাদের জন্য ইংরেজ কবিদের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে এই কবি বাঙালি নয়—তাঁদেরই ভ্রাতৃকবি। কেবল পার্থক্যের জন্য কিংবা স্থানিক বৈচিত্র্যে রঙিন বলে কবিতাগুলি তাঁদের আনন্দ দিয়েছে তা নয়—ভালো লেগেছে কারণ এইগুলি কবিতা—যে কবিতা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবদেশের কবিতার মতো একই প্রকৃতির।"

ইন্ডিয়া সোসাইটি মোট ১০৩-টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'Gitanjali' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন ১৯১২ সালের ১ নভেম্বরে। কবিতা নির্বাচন ও সম্পাদনায় সাহায্য করেন প্রখ্যাত কবি ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স। ইংরাজি গ্রন্থটি কিন্তু বাংলা গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ নয়। এতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র মোট ৫৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি 'গীতিমাল্য'-র ১৬টি, 'নৈবেদ্য'-র ১৫টি, 'খেয়া'-র ১টি, 'শিশু'-র ৩টি, 'স্মরণ'-এর ১টি, 'কল্পনা'-র ১টি, 'চৈতালি'-র ১টি, 'উৎসর্গ'-র ১১টি এবং 'অচলায়তন'-এর ১টি গান 'Gitanjali'-তে স্থান পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোদেনস্টাইনকে, আর ভূমিকা রচনা করেছিলেন বিখ্যাত কবি উইলিয়াম্ বাটলার ইয়েট্‌সই। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ".....These verses will not lie in little well printed books upon ladies' tables, who turn the pages with indolent hands that they may sigh over a life without meaning, which is yet

all they can know of life or be carried about by student at the university to be laid aside when the work of life begins but, as the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon rivers. Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them, this love of God a magic gulf wherein their own bitter passion may bathe and renew its youth." অর্থাৎ এই কবিতাগুলি প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই 'টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট'-এ 'Gitanjali'-র প্রথম সমালোচনা বের হয় ৭ নভেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে লেখা হয়েছিল, ''রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কবিতা ইংরেজি গদ্যে প্রাঞ্জলভাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক ছন্দোবদ্ধে অনুবাদ করেছেন। সঙ্গত কারণে ভাষার অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও কবিতার ভাব দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এই ভারতীয় কবি ধর্ম ও দর্শনকে এক করেছেন। তিনি বিশ্বের ধ্যানে বসেছেন এবং সেই ধ্যান থেকে যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরলপথে উৎসারিত হয়েছে তাঁর 'কবিতা'।" ম্যাকমিলানের সুলভ সংস্করণ 'Gitanjali' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। 'Gitanjali'-র একাধিক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে 'গ্লোব', 'নিউ স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায়। ক্রমে ক্রমে 'বুকম্যান', 'হিবার্ট জুর্নাল' প্রভৃতিতেও সমালোচনা ও প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হল :

'এথেনিয়াম' : ''মিস্টার টেগোরের অনুবাদ গতিহীন, এতে কোনও রঙ চাপানো হয়নি; আছে কেবল এক ভাবাবিষ্ট সৌন্দর্য। ..... অতীন্দ্রিয়তাই কবির প্রেরণা। ....." (১৬. ১১. ১৯১২)

'নেশ্যন' : ''ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখকের নিজস্ব অনুবাদ করা একশ তিনটি গীতিকবিতায় রয়েছে অনন্য সৌন্দর্য, এক উন্নত আধ্যাত্মিকতার ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, অপরিবর্তনশীল অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ, এক অনির্বচনীয় অথচ অত্যন্ত পরিচিত মরমিয়া সুর, যা আমার বিভিন্ন সময়ে শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়বাদীদের কবিতায় পেয়ে এসেছি। ....." (১৬. ১১. ১৯১২)

ট্যাবলয়েড সান্ধ্য পত্রিকা 'গ্লোব' : ''.....তাঁর কাজের মধ্যে সর্বত্র যেন ঈশ্বর মুদ্রিত হয়ে আছে যা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ চিন্তাধারার বর্হিভূত। ....." (১. ৪. ১৯১৩)

একসময় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকার্যের জন্য ডব্লু. বি. ইয়েট্স, এজরা পাউন্ড প্রমুখ কবিদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজেই তাঁর কবিতাগুলি অনুবাদ করতে থাকেন। 'Gitanjali'-তেও আমরা কবিকৃত অনুবাদই পেয়েছি। যদিও রোঁদেনস্টাইনকে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন তাঁর অনুবাদে 'ফরেন রি-ইনকার্নেশ্যন' বা 'বিদেশি জন্মান্তর' হয়েছে। একথা সত্যিই যে 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদক

রবীন্দ্রনাথ আর অন্যান্য সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এক নন। ইংরেজি ভাষায় রচনার গভীর প্রত্যয় তাঁর ছিল না। রোদেনস্টাইনকে তিনি জানান, — ''আমি এত নির্বোধ নই যে আমার ইংরিজি ভাষা, যা বেশী বয়সে আমাকে ধার করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তার জন্য চড়া দাম চেয়ে বসব। তোমার নিশ্চয় মনে আছে কত বাধোবাধো ভাবে, কত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তোমার হাতে আমার 'গীতাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলেম, আমার ইংরিজি বড়োই অদ্ভুত, যার বিন্যাসের জন্য ইশকুলের ছেলেরা পর্যন্ত বকুনি খেতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধা, তাঁর অনুবাদে পাওয়া যায়, যা মূল বাংলা রচনায় নেই। তাই দেখা যায় 'Gitanjali' বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, 'গীতাঞ্জলি' মূলত গান। তার গীতিমূর্ছনার এক চিরস্থায়ী প্রভাব পাঠকমনকে প্লাবিত করে, 'Gitanjali' কিন্তু মূলত কবিতা। সেখানে বিদেশি পাঠকরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধি করলেও 'গীতাঞ্জলি'-র অনির্বচনীয়তা সেখানে অনুপস্থিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি' ও ইংরেজি 'Gitanjali'-র দুটি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে :

(১)

(ক) ''আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।"

(খ) “ART thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my friend? the sky groans like one in despair.

I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend !

I can see nothing before me. I wonder where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black. river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my friend ?”

মূল কবিতাটি গান হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে চিরজাগরূপ থাকে। ‘‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরানসখা বন্ধু হে আমার” — এই অংশটি হয়েছে “Art thou ..... of love, my friend?” এই অংশটি ভাবানুবাদ হয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ হলে এরকম হতো — “Tonight, this stormy night is your rendez-vous / My sweetheart, my friend!” (নবনীতা দেবসেন) ‘‘আজি ঝড়ের রাতে ..... হে আমার” — এই দুই পংক্তিতে কবির নিশ্চিত প্রতীতি ছিল ‘পরানসখা’ বন্ধু শুধু বাইরের নন, তিনি অন্তরের। ‘অভিসার’ শব্দটি আমাদের রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমকে মনে করিয়ে দেয়। কবির চির-আরাধ্য ‘জীবন দেবতা’-ই তাঁর ‘পরানসখা’, তাঁর প্রার্থিত কামনার ধন। ঝড়ের রাতে বাইরের প্রকৃতি যখন উত্তাল, কবির অন্তর্প্রকৃতি তখন অপেক্ষায় অধীর — ‘‘নাই যে ঘুম নয়নে মম, /দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,/চাই যে বারেবার।” কবিতাটিতে রাত্রির অন্ধকারের প্রেক্ষাপটেই চিরবাঞ্ছিতের জন্য অনুসন্ধান নির্মিত হয়েছে। ‘‘সুদূর কোন .... তুমি পার।” কবিতাটির অনুবাদে খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্বোধন ‘পরানসখা’-কে পাওয়া যায় না। অনুবাদে “my friend” শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা ‘পরানসখা’ শব্দটির গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না। ইংরেজি অনুবাদে এই মূল সম্বোধনটির চিহ্নও নেই। দ্বিতীয়ত, মূলে অভিসার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না, কারণ চিরবাঞ্ছিত বা অখণ্ডসত্তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী খণ্ডসত্তার অভিসারযাত্রা সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না অথচ অনুবাদে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে— “Art thou ..... my friend?” তাই মূলে যে কবিভাবনা ছিল সংশয়রহিত, অনুবাদে তা হয়েছে প্রশ্নাকীর্ণ।

(ক) দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে
এবারে তবে গভীর করে ফ্যালো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘনতিমির তলে —

স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে,
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে —
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন ঊষা-পানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।"

(খ) "If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged tired, then draw the veil of darkness thick upon me, even as thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep and tenderly closed the petals of the drooping lotus as dusk.
From the traveller, whose sack of provisions is empty before the voyage is ended, whose garment is torn and dustladen, whose strength is exhausted, remove shame and poverty. and renew his life like a flower under the cover of thy kindly night."

কবিতাটির মধ্যে ''স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে/যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে" অংশটি অনুবাদে হয়েছে "even as thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep." এই অনুবাদ

নিতান্তই সাধারণ। আক্ষরিক অনুবাদ করলে অংশটি এইরকম দাঁড়ায়— "Just as you have secretly and slowly covered the earth with dreams." (নবনীতা দেবসেন) 'গোপনে' ও 'ধীরে ধীরে' এই দুটি মূল ক্রিয়া বিশেষণই কবিকৃত অনুবাদে বাদ পড়েছে এবং 'লেপ' (coverlet) এই শব্দটি যুক্ত হয়েছে। পরের অংশে ইংরেজি কবিতাটি বাংলার ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ''পাথেয় যার ..... ধুলায় অপমানে" ভাষান্তরিত হয়েছে, "From the ..... dustladen." অংশটির আক্ষরিক অনুবাদ এভাবে করা যায় —

"Whose provisions end in the middle of the road
On whom signs of loss are evident
Whose cloths are dirty with dust and humiliations."

(নবনীতা দেবসেন)

কবিকৃত অনুবাদে সবচেয়ে কবিত্বময় পংক্তিটি (''ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে') বাদ গেছে। 'ভ্রমণকারী' প্রভৃতি ব্যাখ্যামূলক বিশেষ্য যোগ করেছেন। এর পরবর্তী অংশে কবিতার মূল মর্মকথাই বাদ পড়েছে। ''ঢাকিয়া দিক ..... সুধাজলে"। অংশটির আক্ষরিক অনুবাদ এইরকম, —

"Let a kind and deep privacy
Conceal his wounds and pains
Effacing shame make him blossom out towards the new dawn
Soothing him in the life giving waters of the dark."

(নবনীতা দেবসেন)

কবি অংশটি এভাবে অনুবাদ করেছেন — "remove shame ..... kindly night." — অংশটি যেন একটু বেশি সোচ্চার হয়ে গেছে। এখানে মূল কবিতার মর্মবেদনার গাঢ় ব্যাকুলতার চিহ্ন প্রকাশ পায়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, 'Gitanjali' বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ হলেও রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে বহু পরিবর্তন করেছেন। অনেক শব্দ বাদ পড়েছে, যার ফলে মূল কবিতার ভাবনাই পাল্টে গেছে। আবার অনেক শব্দ তিনি সংযোজনও করেছেন। যা মূলে পাওয়া যায় না। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'ফর্টনাইটলি রিভিউ'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে পাউন্ডের প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, ''এতসব ছাঁটকাটের পরেও আমরা অনুবাদে কী পাই ভাবতে গেলে আমি কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের 'প্রসঙ্গ' অথবা 'বিষয়বস্তু'-র কথা আগে তুলব না। আগে তুলব তাঁর বাক্‌ভঙ্গি ও শিল্পশৈলীর দিকটা।" পাউন্ড

কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রথমত, বাংলায় বিভক্তি ব্যবহারের জন্য বাক্যের বিন্যাসে প্রচুর স্বাধীনতা আছে, ফলে কোনো শব্দ এদিক ওদিক হলেও তাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেটা ইংরেজিতে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বিভক্তিযুক্ত ধাতুরূপ, শব্দরূপ দিয়ে মিল দেওয়া অনেক সহজ। তৃতীয়ত, বাংলায় সমাজবদ্ধ শব্দ তৈরির দরুন শিল্পসৃষ্টিতে অনেক স্বাধীনতা আছে। চতুর্থত, ভারতীয় রাগরাগিনী, সুর কবিতার মূলভাব অর্থাৎ কোন ঋতু, দিনের কোন সময় ইত্যাদির নির্দেশ দেয় এবং তার ফলে কবিতা বোঝার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পের এইসব ঐশ্বর্য আমরা অনুবাদে পাই না—একথা পাউন্ড বলেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রসংগীতের ইংরেজি অনুবাদে এইসব সমস্যা আছে, যার ফলে তা মিলহারা, সুরহারা, ছন্দহারা হয়ে উঠেছে।

## ১১১.৫ সারাংশ

সাহিত্যিকরা অনেকসময় নিজের মূল রচনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নতুন অর্থ আরোপ করেন। একে রূপান্তর বলা হয়। রূপান্তর-প্রক্রিয়ার ফলে অনেকসময় দুটি সাহিত্যকে স্বতন্ত্র সাহিত্য মনে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' ও 'তপতী' নাটকদুটি। রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তরের বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন প্রথমত, গল্প থেকে নাটকের রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর। তাঁর তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর হয়েছিল। তৃতীয়ত, কাব্যকবিতা থেকে নাটকের রূপান্তর। দুটি কবিতাকে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চতুর্থত, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। তাঁর একটিমাত্র পদ্যনাটককে গদ্যনাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পঞ্চমত, গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকে রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি গদ্যনাটককে পুনরায় গদ্যনাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ষষ্ঠত, তাঁর দুটি গীতিনাট্যের রূপান্তর হয়েছিল। সপ্তমত, দুটি নৃত্যনাট্যের রূপান্তর। এছাড়া আছে নাট্যরূপান্তর।

তবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল ভাষান্তরকালীন রূপান্তর। তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটককে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তবে তাঁর ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ। 'Gitanjali'-র জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া সোসাইটি মোট ১০৩টি কবিতার অনুবাদ Gitanjali নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র পাশাপাশি 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'শিশু', 'স্মরণ', 'কল্পনা', 'চৈতালি',

'উৎসর্গ' এবং 'অচলায়তন'-এর কবিতা স্থান পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোদেনস্টাইনকে আর ভূমিকা রচনা করেছিলেন ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স। বইটি প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে সমালোচনা ও প্রশংসা দুই-ই প্রকাশিত হতে থাকে। এইসব পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বুকম্যান', 'গ্লোব', 'এথেনিয়াম', 'নেশ্যন', 'হির্বাট জুর্নাল', 'নিউ স্টেট্‌সম্যান'-প্রভৃতি।

প্রথমদিকে কবি অনুবাদকার্যে ইয়েট্‌স, পাউন্ড প্রমুখ কবিদের মতামতকে গুরুত্ব দিলেও, পরবর্তীকালে তিনি নিজেই অনুবাদ করতে শুরু করেন। তবে নিজের ইংরেজি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই দ্বিধা ছিল। তাই 'Gitanjali'-বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হয়ে উঠেছে। 'Gitanjali'-তে তিনি বহু ভাব ও শব্দ যেমন যোগ করেছেন, তেমনি বহু ভাব এবং শব্দ বাদও দিয়েছেন। যার ফলে মূল কবিতার অর্থ অনেক সময়ই বদলে গেছে। এবিষয়ে পাউন্ডের তিনটি মূল প্রশ্নের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরেজি অনুবাদ সুরহারা, মিলহারা, ছন্দহারা, স্বচ্ছন্দ পুনর্বিন্যাস মাত্র।

## ১১১.৬ অনুশীলনী—২

**নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।**

**১. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) 'শেষের রাত্রি' গল্পটির রূপান্তরিত নাম —

(১) গৃহপ্রবেশ

(২) মুকুট

(৩) মুক্তির উপায়

(খ) 'রাজা ও রানী'-র রূপান্তরিত রূপ 'তপতী'-তে গান আছে—

(১) দশটি

(২) সাতটি

(৩) একটিও নয়।

(গ) 'Gitanjali'-র ভূমিকা রচনা করেছিলেন—

(১) ইয়েট্‌স

(২) পাউন্ড

(৩) রবীন্দ্রনাথ

(ঘ) 'Gitanjali'-তে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতা সংখ্যা —

(১) ৫৩ টি

(২) ৫৫ টি

(৩) ১৬ টি

২. রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে যা জানেন নিজের ভাষায় লিখুন।

৩. যে-কোনো একটি কবিতা অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে পাউন্ডের মতামত নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

## ১১১.৭ উত্তরমালা

১. (ক) গৃহপ্রবেশ

(খ) দশটি

(গ) ইয়েট্‌স

(ঘ) ৫৩ টি

২য় প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

## ১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি


১. অশ্রুকুমার সিকদার — রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য।

২. নবনীতা দেবসেন — 'প্রবাসী জন্মান্তর' প্রবন্ধ ও 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গ্রন্থ।

৩. কল্যাণ কুন্ডু — ইংরেজি 'Gitanjali' প্রসঙ্গে কিছু কথা — 'পশ্চিমবঙ্গ'।